একক-৪ ❑ ভারতীয় প্রেক্ষিতে সুশাসন

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ ভূমিকা

৪.৩ ভারতীয় প্রেক্ষিত

৪.৪ আমলাতন্ত্রে পরিবর্তন

৪.৫ সিটিজেন্‌স্ চার্টার

৪.৬ স্বচ্ছ শাসন : তথ্যের অধিকার

৪.৭ ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সুশাসন

৪.৮ সারসংক্ষেপ

৪.৯ নমুনা প্রশ্নাবলী

৪.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হল—

- ভারতীয় প্রেক্ষিতে সুশাসনের ধারণা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবগত করা।
- স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষের আমলাতন্ত্রের পরিবর্তন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা।
- সিটিজেন্‌স্ চার্টার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সম্যক ধারণা প্রদান করা।
- স্বচ্ছ শাসনের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে তথ্যের অধিকার বিষয়ে ধারণা প্রদান করা।
- ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অবগত করা।

৪.২ ভূমিকা

আজ জনপ্রশাসন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সমস্ত আলাপ-আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে সুশাসনের ধারণাটি উঠে আসে। মনে করা হয় উন্নয়ন পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে এটি মূল বিবেচ্য হওয়া উচিত। ১৯৯২-এ প্রকাশিত বিশ্ব ব্যাঙ্ক-এর *Governance and Development*-এ Governance-এর তিনটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। প্রথমতঃ, একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে। দ্বিতীয়তঃ, এমন একটি প্রক্রিয়া হিসাবে যার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ অর্থনীতি ও সামাজিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা করে। তৃতীয়তঃ, সরকারের নীতি রূপায়ণ করা ও সাধারণভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করার পরিকাঠামোগত ক্ষমতা থাকা।

বর্তমানে উন্নয়ন ও সুশাসনকে একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত মনে করা হয়। বর্তমানে উন্নয়নকে কেবলমাত্র আর্থিক বৃদ্ধি হিসাবে দেখা হয় না। উন্নয়ন বলতে বোঝায় মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ থেকে শুরু করে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা। আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন ব্যতিরেকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আবার, সুশাসন না থাকলে সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

বিশ্বব্যাঙ্ক উন্নয়ন ও সুশাসনকে সংযুক্তভাবে দেখার পক্ষে জোরালো সওয়াল করে। এই বক্তব্য তুলে ধরা হয় তার একাধিক প্রকাশনায়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *Governance : The World Bank Experience,* যেটি ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৯৭-এ প্রকাশিত *The State is a Changing World*।

৪.৩ ভারতীয় প্রেক্ষিত

সত্তরের দশকে বিশ্বব্যাপী শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্য ক্ষেত্রে ভয়াবহ মন্দা দেখা দেয়। গোটা ইউরোপ এই মন্দার শিকার হয়। দক্ষিণপন্থী থেকে শুরু করে বামপন্থী সরকারগুলি সকলেরই টালমাটাল অবস্থা হয়। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সংকটের ছায়া দেখা যায়। বৈদেশিক ঋণের বোঝা, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলির ব্যর্থতা, বেকারত্ব, ছাঁটাই, শ্রমিক অসন্তোষে দেশগুলি তোলপাড় হতে থাকে। এর ফলে রাষ্ট্রের ভূমিকার বিশ্বাসযোগ্যতা অনেকক্ষেত্রেই ক্ষুণ্ণ হতে থাকলো। এহেন বৈধতার সংকটকালে সীমিত রাষ্ট্র ও মুক্ত অর্থনীতির পক্ষে সওয়াল ওঠে। এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রেগন এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থ্যাচার। ক্রমেই পশ্চিমী দেশগুলি এই নীতিকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ হিসাবে গ্রহণ করে। এই উদারিকরণ প্রক্রিয়া ক্রমেই বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করে। উদারিকরণনীতি গ্রহণের পক্ষে আর্থিক সঙ্কটাপন্ন দেশগুলির উপর বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক মনিটারি ফান্ডের চাপ আসে। উদারিকরণ নীতির মূল প্রতিপাদ্য ছিল সরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগ কমানো, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করা; প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র বাড়ানো ও বাজার পরিচালনা ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীলতা বাড়ানো।

১৯৯১ সালে ভারতের নরসীমা রাও সরকারের অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে নতুন অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯৯০-৯১ সালে ভারতের অর্থনীতি চরম সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থাগুলি যথা বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আই. এম. এফ.-এর দিক থেকে অর্থনৈতিক সংস্কার মেনে নেওয়ার জন্য জোরালো চাপ আসছিল। এ হেন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে নতুন অর্থনীতি সংক্রান্ত ঘোষণা হয়। পূর্ববর্তী চার দশক অনুসৃত নেহরু মডেলের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার চিন্তাভাবনার অবসান ঘটে। পশ্চিমের দেশগুলির মতই ভারত উদারীকরণ ও মুক্ত বাজারের অর্থনীতি গ্রহণ করে; কাঠামোগত সমঝোতা বা Structural Adjustment-এর ভিত্তিতে নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করে। ১৯৯২-৯৭ সালের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারের ভূমিকা ও পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে পূণর্মূল্যায়ন ও পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। সরকারি ক্ষেত্রের পুণর্গঠন প্রয়োজন এমনটাই মনে করা হয়। মনে করা হয়, সরকারের সঠিক কাজ হবে বেসরকারি সংস্থা, পঞ্চায়েত ও সমবায়ের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের উপযুক্ত অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা।

এই পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে উঠে আসে সুশাসনের বিষয়টি। ১৯৯৬-এ নভেম্বর মাসে Chief Secretary-দের কনফারেন্স্-এ বিষয়টি আলোচিত হয়। এই সম্মেলন থেকে সরকারে প্রশাসনিক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে বেশ কিছু

সুপারিশ উঠে আসে। ভারতের অর্থনীতিকে বাজারমুখী করার লক্ষ্যেই এই সুপারিশগুলি করা হয়। সুশাসনের চিন্তাভাবনা তারই অংশ বিশেষ। এই সম্মেলনে উঠে আসা সিদ্ধান্তগুলি জনসাধারণের মতামতের জন্য তুলে ধরা হয়। সরকারি আধিকারিক থেকে শুরু করে, বেসরকারি সংস্থা, বিশেষজ্ঞ, নাগরিক গোষ্ঠী প্রভৃতির মতামত আহ্বান করা হয়। ১৯৯৭-এর মে মাসে মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে প্রস্তাবগুলি আলোচিত হয়; সেখানে প্রধানমন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন। দেশের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতারা Chief Secretary-দের প্রস্তাবগুলি সমর্থন করেন এবং একটি Action Plan গ্রহণ করেন। শুরু হয় সরকারিভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, স্বাধীন ভারতে শুরু থেকেই জাতি গঠন (nation-building) এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (ocio-economic development)-এর উপর জোর দেওয়া হয়। এমনকি স্বাধীনতার আগেও আর্থ সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টি জাতীয় রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্যে প্রায়শই উঠে আসে। স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার সময়ে গণপরিষদে নেহরুর বক্তব্য ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, ''The first task of the Assembly is to free India through a new Constitution, to feed the starving people and clothe the naked masses, and to give every Indian fullest opportunity to develop himself according to his capacity.... If we cannot solve this problem soon, all our paper Constitutions will become useless and purposeless.''

অর্থাৎ, গণপরিষদের সামনে প্রথম কাজ হল একটি নতুন সংবিধানের মাধ্যমে ভারতকে মুক্ত করা, ক্ষুধার্ত মানুষকে খাদ্য দেওয়া, নগ্ন মানুষকে আভরণ দেওয়া আর প্রতিটি ভারতীয়কে নিজের বিকাশ ঘটানোর পূর্ণ সুযোগ করে দেওয়া।...এই সমস্যার আশু সমাধান না করতে পারলে আমাদের সমস্ত কাগুজে সংবিধান ব্যর্থ হবে। তবে সংবিধান রচনার সময়ে Governance শব্দটির খুব একটা ব্যবহার ছিল না। সংবিধানের প্রস্তাবনায় শব্দটি একবারও ব্যবহৃত হয়নি। দেখা যায়, শব্দটি একবার মাত্র সংবিধানে ব্যবহৃত হয়েছে সেটি Directive Principles of State Policy-তে ৩৭নং ধরায়। সেখানে বলা হয়, ''The provisions contained in this part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws.''

Directive Principles of State Policy-তে উল্লিখিত নীতিগুলির মধ্যে আছে—

(১) জনসাধারণের জীবনযাত্রা নির্বাহ করার যথাযথ পদ্ধতির অধিকার।

(২) জনগোষ্ঠীর সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার এমন ভাবে বিস্তৃত হবে যাতে সর্বাধিক জনকল্যাণ সম্ভব হয়।

(৩) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত নয় যাতে সম্পদ জনস্বার্থের বিপক্ষে কুক্ষিগত হয়।

(৪) একই কাজের জন্য পুরুষ ও নারীর সমান মজুরি হওয়া।

(৫) পুরুষ ও নারী কর্মীদের স্বাস্থ্য ও ক্ষমতা ও শিশুদের বয়স যেন লাঞ্ছিত না হয় এবং আর্থিক কারণে যেন নাগরিকরা এমন পেশায় প্রবেশ করতে বাধ্য না হয় যেটা তাদের বয়স ও ক্ষমতার অনুপযুক্ত।

দেখা যায়, Directive Principles-এ শাসন প্রক্রিয়ার 'content'-এর উপর জোর দেওয়া হয়। ১৯৯৭-এ শিশুদের সুরক্ষার জন্য আরো একটি নীতি এই তালিকায় স্থান পায়। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হওয়া, তথা তৃণমূল স্তরে প্রশাসনের সঙ্গে জনসাধারণের যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে Governance-এর ধারণার বাস্তবায়ন কিছুটা হলেও অগ্রসর হয়। ১৯৭৮-এর অশোক মেহ্‌তা কমিটির সুপারিশের ফলে দেখা যায় ১৯৮০-র দশকে পঞ্চায়েতের বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ অনেকটাই বৃদ্ধি পায়। কারণ হল, পঞ্চায়েতি রাজ সংস্থাগুলিকে এবার কেবলমাত্র উন্নয়নের সংস্থা হিসাবে না রেখে রাজনৈতিক রূপ দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে, আমরা জানি, সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪তম সংশোধনের মাধ্যমে স্থানীয় স্ব-শাসন সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে। তবে, সমস্যা হল, তার পরও ক্ষমতা হস্তান্তর অনেকটাই রাজ্য সরকারগুলির মর্জির উপর থেকে যায়। তবু, তার ইতিবাচক দিক হিসাবে দেখা যায় স্থানীয় পর্যায়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশন দ্বারা নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা বাধ্যতামূলক হয়, সরাসরি নির্বাচিত গ্রাম সভার বিকেন্দ্রীকৃত শাসন ব্যবস্থায় গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়; নারী, তফসিলি জাতি ও জনজাতিদের জন্য সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে তাদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করে; এবং প্রতি পাঁচ বছরে রাজ্য ফাইন্যান্স কমিশন স্থানীয় সংস্থাগুলি কি ভিত্তিতে এবং কত অনুদান রাজ্যের কাছ থেকে পাবে তার সুপারিশ করে।

৪.৪ আমলাতন্ত্রে পরিবর্তন

স্বাধীনতা-উত্তর ভারত তার প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনেকটাই বৃটিশ শাসনকালের কাঠামো থেকে প্রাপ্ত হয়। ভারতে শাসন কালে ব্রিটিশ শাসকগণ তাদের উপনিবেশিক প্রশাসনিক কাঠামো সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলেছিল। ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে শোষণ করে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করা ও দখলীকৃত দেশে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন যন্ত্রকে চিরস্থায়ী করা। ফলে, শাসন প্রক্রিয়ার মূল্য লক্ষ্য ছিল—

(১) দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

(২) রাজস্ব সংগ্রহ করা।

(৩) ব্রিটিশ আধিপত্য বজায় রাখা।

(৪) ব্রিটিশ রাজের অনুগত বিশ্বস্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

দেখা যায় স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারত ব্রিটিশ প্রশাসনিক ঐতিহ্যের কাঠামোগত, সমাজতাত্ত্বিক ও কার্যগত উত্তরাধিকার অনেকটাই বহন করে। সময়ের সাথে সাথে আমলাতন্ত্রকে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা সম্পন্ন ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। কেউ কেউ তার 'ওয়েবেরিয়' বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কেউ বা তাকে জাতি ধর্ম, গোষ্ঠী, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বা বড় জমির মালিকের পক্ষপাতিত্ব করতে দেখে।

স্বাধীনতার সময়ে প্রশাসনিক পরিকাঠামো যথেষ্ট শক্তিশালী হলেও দেখা যায় ৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে তা নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। ১৯৬৪ সালে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু মারা যান; জাতীয় অর্থনীতির হাল খুব একটা ভাল ছিল না; প্রশাসনিক দূর্নীতি দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং তার পাশাপাশি ছিল ব্যাপক রাজনৈতিক দূর্নীতি। এই পটভূমিতে প্রশাসনকে সঠিক রাস্তায় পরিচালিত করার লক্ষ্যে Administrative Reforms Commission গঠিত হয়। লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তখন প্রধানমন্ত্রী। ১৯৬৮ থেকে

১৯৭০ সালের মধ্যে এই কমিশন তার নির্ধারিত কাজ করে, ৫৮১টি প্রস্তাব সম্বলিত ১৯টি রিপোর্ট জমা দেয়। ব্যাপক সংস্কারের প্রস্তাব আনা হয়। পরবর্তীকালে প্রশাসনিক সংস্কার আনার আরো নানাবিধ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

১৯৬৯ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি 'committed bureaucracy'-র পক্ষে সওয়াল করেন। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭-এর ভিতর, ইমার্জেন্সির সময়ে, উচ্চ পর্যায়ের কিছু আমলার রাজনৈতিক আনুগত্যের বিষয়টি শাহ্ কমিশনের রিপোর্ট-এ সমালোচিত হয়।

নব্বই-এর দশকের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পরে আমলাতন্ত্রে প্রথম সংস্কার আনার প্রস্তাব আসে পঞ্চম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশে। ১৯৯৬-এর এই সুপারিশে একদিকে যেমন সরকারের কাজের পরিধি ও দায়িত্ব হ্রাস করার কথা বলা হয়, অপর দিকে তেমন আমলাদের বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশের মধ্যে ছিল ''outsourcing''-এর সুপারিশ ও ''public-private partnership''-এর সুপারিশ। মূল উদ্দেশ্য ছিল আমলাতন্ত্রকে আধিপত্যের স্থানে না রেখে সহযোগীর স্থানে নিয়ে আসা, যেখানে সরকার বাজার ও পৌর সমাজকে উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কাজ করতে সাহায্য করবে। তবে, প্রশাসনিক ও আমলাতন্ত্রের সংস্কারের লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ গৃহীত হলেও রাজনৈতিক দলগুলির কাছে তা খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। প্রশাসন রাজনৈতিক নানা টানাপোড়েনের মধ্যে আটকে থেকেছে। তার বিরুদ্ধে প্রায়শই পক্ষপাতের অভিযোগ উঠেছে।

৪.৫ সিটিজেন্‌স্ চার্টার

নব্বই-এর দশক থেকে যে সুশাসনের ধারণা গুরুত্ব পেয়ে এসেছে, Citizen's Charter-কে তার অপরিহার্য দিক বলে মনে করা হয়। এমন একটা সময়ে যখন জনপ্রশাসনের প্রতি জনসাধারণের আস্থা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছিল এবং সার্বিকভাবে সরকারের যোগ্যতা প্রশ্নের মুখে পড়ছিল। Citizen's Charter-কে অনেকটাই সুরাহার পথ হিসাবে দেখা হয়।

Citizen's Charter-এর মূল বৈশিষ্ট্য হল (ক) জনপরিষেবার ক্ষেত্রে কাজের মানদন্ড প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষিত করা (খ) কর্ম প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে স্বচ্ছতা বজায় রাখা ও তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করা, (গ) উপভোক্তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা ও তাদের চাহিদা সম্পর্কে জানা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাকে গুরুত্ব দেওয়া, (ঘ) সমস্ত উপভোক্তাকে সমানভাবে পরিষেবা দেওয়া। আধিকারিকদের নামের ব্যাজ পরা উচিত ও নম্র সহযোগিতার আচরণ করা উচিত; (ঙ) যদি পরিষেবা দানে কোথাও কোন ভুল হয়, দ্রুত ক্ষমা প্রার্থনা করে তা শোধরানো উচিত। অভিযোগ দায়ের করার প্রক্রিয়া, যতটা সম্ভব, সুপ্রচারিত ও সহজ হওয়া দরকার। (চ) জাতীয় সম্পদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুযোগ্য পরিষেবা প্রদান করা উচিত এবং নাগরিক গোষ্ঠীর সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত মানদন্ডের মাপকাঠিতে কাজের স্বাধীন মূল্যায়ন করা উচিত।

সুশাসনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। Citizen's Charter সেই লক্ষ্যেই অগ্রসর হওয়ার পদক্ষেপ। প্রতিদিন প্রশাসনের সাথে তার আদান প্রদানে নাগরিকরা যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয় সেইগুলির মোকাবিলা করতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই Citizen's Charter-এর ধারণাটি আসে। পরিষেবা দাতা ও গ্রহিতার মধ্যে সু-সম্পর্ক স্থাপন করা তার লক্ষ্য।

ব্রিটেনে ১৯৯১ সালে প্রথম এই ধারণাটি উঠে আসে ও গৃহীত হয়। এর লক্ষ্য ছিল নাগরিক স্বার্থ মাথায় রেখে ক্রমাগত পরিষেবা উন্নততর করা। মূল উদ্দেশ্য ছিল নাগরিকদের সরকারি পরিষেবার ক্ষেত্রে ক্ষমতায়ন ঘটানো।

ব্রিটেনের এই প্রচেষ্টায় পৃথিবীর অনেক দেশেই আগ্রহ সঞ্চারিত হয়। এর ফলে যে রাষ্ট্রগুলি Citizen's Charter চালু করে তাদের মধ্যে ছিল অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, কানাডা, স্পেন প্রভৃতি। ভারতেও ১৯৯৭-এ Citizen's Charter চালু হয়।

৪.৬ স্বচ্ছ শাসন : তথ্যের অধিকার

তথ্যের অধিকারকে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও সুশাসনের জন্য আজ অপরিহার্য্য মনে করা হয়। তথ্যের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা আনা সম্ভব; আর, কেবলমাত্র প্রশাসনিক স্বচ্ছতা থাকলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়।

১৯৯৬-এর Chief Secretary-দের সম্মেলনে স্বচ্ছতা ও তথ্যের অধিকারের সপক্ষে মত প্রকাশ করা হয়েছিল। তারা মনে করে সমস্ত সরকারী দপ্তরে স্বচ্ছতা ও তথ্য পরিষেবার এক নতুন সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। তারা এও মনে করে যে সরকারে যত বেশি গোপনীয়তা থাকবে তত বেশি দুর্নীতির সম্ভাবনা থাকবে।

নব্বই-এর দশক থেকে উঠে আসা এই চিন্তা ভাবনা স্পষ্টতই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এক নতুন দৃষ্টিকোণ। ব্রিটিশ শাসনকাল থেকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কার্যকলাপের বিষয়ে গোপনীয়তা বজায় রাখাই ছিল প্রচলিত রেওয়াজ। জনসাধারণ ও প্রচার মাধ্যমকে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে মূল বাধা ছিল ১৯২৩-এর Official Secrets Act। ১৯২৩-এর আইনটির ফলে সরকারী কর্মচারিদের কোন তথ্য প্রকাশ করাটা ছিল অপরাধ! এই আইনের ফলে সরকারি কর্মচারিরা নাগরিকদের কাছে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্য অনেকাংশে গোপন রাখে।

নব্বই-এর দশক থেকে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে Official Secrets Act-এর সংশোধন আনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। সেই মত সংশোধন আনা হয়। তার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশনামা জারি করে সরকারি বিভাগগুলোর কার্যকলাপের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা আনার প্রচেষ্টা চালায়।

কম্পিউটার নির্ভর National Informatics Centre (NIC) এর মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন আরো সহজ করা হয়।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান সরাসরিভাবে জনসাধারণকে তথ্যের অধিকার না দিলেও মনে করা হয় তা প্রকারান্তরে ১৯নং (১) (ক) ধারায় দেওয়া আছে, যেখানে নাগরিকদের মত প্রকাশের অধিকার মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত।

তথ্যের অধিকারকে আইনি স্বীকৃতি দিতে ২০০৫-এ সংসদ তথ্যের অধিকার আইন বা Right to Information Act (RTI) পাস করে। এই আইনটির পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত, প্রশাসনের প্রায় সবটাই এর আওতায় আসে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে শুরু করে স্থানীয় প্রশাসন কোনটাই বাদ থাকে না। এই আইনের মাধ্যমে নাগরিকদের অংশগ্রহণ অনেক বেশি সফল হবে এমনটাই মনে করা হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য প্রসঙ্গে তার প্রস্তাবনায় বলা হয়

''...to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority, the constitution of a Central Information Commission and State Information Commission and for matters connected therewith and incidental thereto.''

তথ্যের অধিকার আইনের মূল বক্তব্য হ'ল—

- নাগরিকদের তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে।
- এই 'তথ্য' বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যথা নথি, ই-মেল, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত তথ্য প্রভৃতি।
- সাধারণতঃ একজন আবেদনকারী তার আবেদন করার তিরিশ দিনের মধ্যে তথ্য পেতে পারে।
- বিশেষ ক্ষেত্রে (যদি তা জীবন-মরণ বা স্বাধীনতার প্রশ্ন হয়) ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেও তথ্য পাওয়া যায়।
- লিখিত বা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে আবেদন জমা হলে সরকারি আধিকারিক তথ্য দিতে বাধ্য।
- বিশেষ কিছু ধরনের তথ্য দেওয়া অবশ্য নিষিদ্ধ আছে।
- তথ্য চেয়ে কেউ দরখাস্ত করতে চাইলে সে দরখাস্ত না নেওয়া বা যথা সময়ের মধ্যে তথ্য না দেওয়া জরিমানাযোগ্য অপরাধ।
- কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলিকে যথাক্রমে Central Information Commission ও State Information Commission গঠন করতে বলা হয়।

উল্লিখিত ব্যবস্থার ফলে, সরকারি সংস্থায় অনেক বেশি স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা আনা সম্ভব। সে দিক থেকে বিচার করলে মানতেই হয় তথ্যের অধিকার আইন নিঃসন্দেহে সুশাসনের দিকে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

৪.৭ ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সুশাসন

নব্বই-এর দশক থেকে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তার উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ে। বৈদ্যুতিক মাধ্যমে, দ্রুত, সহজভাবে, কম ব্যয়ে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয়। শাসন অনেকটাই ই-শাসনের রূপ নেয়। Manuel Castells তাঁর গ্রন্থ *The Information Age : Economy, Society and Culture* (Book I)[Oxford : Blackwell, 1996]-এ লেখেন :

''As a historical trend, dominant functions and processes in the information age are increasingly organized around networks.''

ই-গভর্নেন্স-এর মূল অর্থ হল কম্পিউটারের মাধ্যমে সরকারের তথ্যাদি সংরক্ষণ করা ও online পরিষেবা প্রদান করা। ভারত সরকার এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শাসনকে SMART শাসনে রূপান্তরিত করার কথা বলে। এই SMART শাসন হল Simple, Moral, Accountable, Responsive ও Transparent। অর্থাৎ, সহজ, নৈতিক,

দায়বদ্ধ, সংবেদনশীল ও স্বচ্ছ। Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN), International network (internet), মোবাইল ও কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে আশা করা হয় এই উন্নততর পরিষেবা সম্ভব হবে।

উনিশশো আশির দশকে ভারতে সরকারি ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার প্রথম চালু হয়। নব্বই-এর দশকে তার ব্যবহার ব্যাপকতর হয়। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে ই-গভর্নেন্স-এর বিষয়টি গুরুত্ব পায়। একদিকে যেমন তার চাহিদা উঠে আসে। অপরদিকে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় সরকারের আগ্রহও বৃদ্ধি পায়। অগ্রগতি এতই দ্রুত হয় যে দেখা যায় ২০১৪-র মধ্যে এক লক্ষ কোটি সরকারি ই-আদান প্রদান হয়। দু-একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র যেখানে নাগরিকরা online পরিষেবা পান—কেন্দ্রীয় সরকারের নির্মল ভারত অভিযান, পাসপোর্ট সেবা প্রকল্প, চণ্ডিগড়ে ই-সম্পর্ক, কর্ণাটকের ভূমি প্রকল্প, মধ্যপ্রদেশের গ্রাম সম্পর্ক। যে দপ্তরগুলির কাজকর্মের ক্ষেত্রে ই-পরিষেবা লব্ধ হয় সেগুলির মধ্যে আছে ভূমি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুলিশ, রেল।

ই-পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে নিঃসন্দেহে নাগরিকদের পরিষেবা লাভ করা অনেকটাই সহজ হয়েছে। সরকারি কোন কাজ করতে হলে নাগরিকদের আগের মত লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হয় না, জটিল প্রক্রিয়ায় সময় নষ্ট করতে হয় না। কর্মচারীদের আচরণের শিকারও হতে হয় না। যেখানে যেখানে ই-পরিষেবা পাওয়া যায় সেখানে নিঃসন্দেহে শাসন অনেক বেশি স্বচ্ছ, সংবেদনশীল ও দক্ষ। তবে, সমস্যা হল সব প্রত্যন্ত গ্রামে এই পরিষেবা এখনও যথাযথ ভাবে পৌঁছয়নি।

ই-গভর্নেন্স্ নাগরিকদের ক্ষমতায়ন ও সার্বিক সুশাসনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও ভারতে এখনও বেশ কিছু সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। সেগুলির মধ্যে আছে—সবার ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের সুযোগ না থাকা, কম্পিউটার সংক্রান্ত জ্ঞান না থাকা, প্রথাগত শিক্ষার অভাব, পরিষেবা ব্যবহারের ক্ষেত্রে দরিদ্র জনসাধারণের আর্থিক সীমাবদ্ধতা প্রভৃতি।

৪.৮ সারসংক্ষেপ

জনপ্রশাসনের চিন্তাভাবনায় আজ সুশাসনের ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সনাতন জনপ্রশাসনের চিন্তা ছিল প্রশাসনিক পরিকাঠামো কেন্দ্রিক। সুশাসনের ধারণা শাসনের ক্রিয়া নির্ভর, মূল্যভিত্তিক ধারণা। নব্বই-এর দশক থেকে বিশ্বের পরিবর্তিত আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার তাগিদ দেশে দেশে অনুভূত হয়। এই পটভূমিতে ভারতও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর হয়ে ওঠে। এই সুশাসনের শর্ত হল ব্যাপক প্রশাসনিক পরিবর্তন যার সহায়তায় প্রশাসন, পৌর সমাজ ও বাজারের তৎপরতায় সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। নাগরিকরা স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ, সংবেদনশীল পরিষেবা পাবে। প্রশাসনিক নানা পরিবর্তনের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল Citizen's Charter ব্যবস্থা চালু করা, তথ্যের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বাড়ানো ও দুর্নীতির সম্ভাবনা হ্রাস করা, এবং ই-গভর্নেন্স-এর মাধ্যমে উপভোক্তাদের উন্নততর পরিষেবা প্রদান করা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও নানা আর্থ-সামাজিক সমস্যা পূর্ণ সুফল লাভের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।